ওতিয়া ইওসেলিয়ানি

বাচো আর গোচা

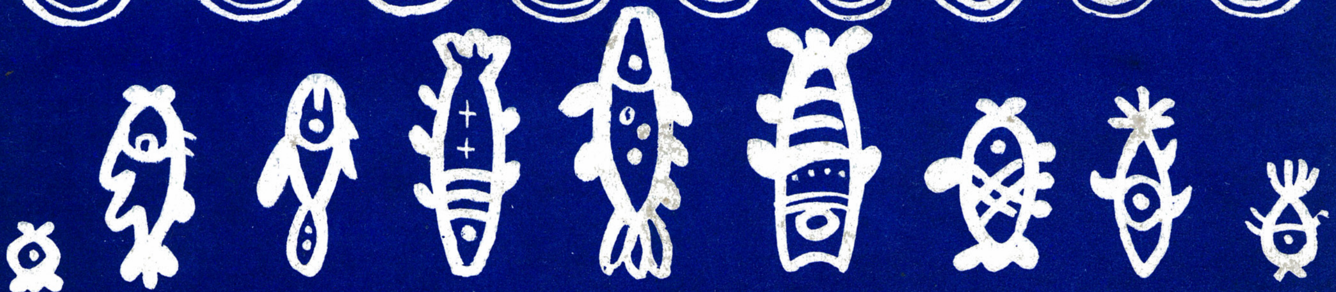


প্রগতি প্রকাশন : মস্কো



ছোট্টো ছেলে বাচো একজন দুঁদে শিকারী। বাচো যখন প্রথম দাঁড়াতে শিখল, তার পদভারে কেঁপে উঠল মেদিনী। যে বনে বাঘ থাকে, সেখানে শিকার করে বাচো। সেখানেই তার পাতানো ভাই বাঘের বাচ্চাদের বাস। মায়ের দুধের কথা বাদ দিলে বাচো সবচেয়ে ভালোবাসত বাঘিনীর দুধ। একদিন হারিয়ে গেল বাচোর পাতানো ভাই বাঘের বাচ্চারা। বাচো যদি সাহায্য না করত, তাহলে খুবই শোকের ব্যাপার হতে পারত।

ওতিয়া ইওসেলিয়ানির সঙ্গে আমাদের বিদেশের ছোটো পাঠকদের পরিচয় আগেই হয়েছে। কিছুদিন আগে বেরিয়েছিল তাঁর ‘একটি দিন’। প্রতিভাবান জর্জীয় লেখকের দ্বিতীয় বই ‘বাচো আর গোচা’। বইটি প্রকাশিত হচ্ছে প্রখ্যাত রুশ শিল্পী ইউরি মলকানভের রঙীন ছবি দিয়ে।





একদিন বাচোর মা ছিলেন না বাড়িতে। ছিল শুধু রামাজি আর মানানা।

কী চমৎকার, দাদাকে কোথাও যেতে হবে না। দিদি সঙ্গে থাকলে তো আরো ভালো।

কিন্তু যতই হোক, মা না থাকলে ভারি খারাপ লাগে।

সিংহ যদি আমায় দেখে আঁৎকে ওঠে, যদি জ্যান্ত ধরি বাঘিনীকে, ভাই সম্বন্ধ পাতাই তার বাচ্চাদের সঙ্গে, তাহলেও মা না থাকলে মন ভরে না।

দিনে না থাকলে তো খারাপই, কিন্তু সন্ধেতেও যদি না থাকে!..

তাই ছোটো ভাইকে শান্ত করার জন্যে মানানা আর রামাজি তাকে গল্প শোনাতে লাগল।

সন্ধে হতে, আঙিনায় যখন নিঃশব্দে উড়ে এল জোনাকির ঝাঁক, রামাজিকে বললে মানানা:

— আজ তোর পালা। গল্প শোনা বাচোকে।

মাথা নেড়ে রামাজি বললে:

— পারব না। দেখছিস না, দেয়াল-পত্রিকার জন্যে ছবি আঁকছি।

— কিন্তু তোর দেয়াল-পত্রিকার খাতিরে তো ওকে ঘুম না পাড়িয়ে রাখা যায় না।

— ভাবনা নেই, গল্প না শুনেই ঘুমবে!

— ঘুমোব না! — জেদ ধরলে বাচো।

— না ঘুমোস, ঘুমবি না! — কাঁধ ঝাড়া দিল রামাজি।

— বেশ, ঘুমোবই না!!! — ঠোঁট ফোলালে বাচো।

— আচ্ছা, আচ্ছা বাচো, — সান্ত্বনা দিলে রামাজি, — গল্প বলব তোকে...

— এক-যে ছিল খোকা।

— আমি! তাই না!

— চেঁচাস না! এক-যে ছিল বাচো। আর পাশের বাড়িতে থাকত আরেকটি ছেলে — গোচা।

— নাদুসনুদুস গোচা!

— ফোড়ন কাটিস না! নইলে গল্প বন্ধ।

বাচো ভাবল, 'দাদার সঙ্গে ঝামেলা করে লাভ নেই, সত্যিই হয়ত গল্প শোনাবে না...' — তাই চুপ করে রইল। আর রামাজি বলে চলল:

— জামবাটিতে রুটি ফেলে দুধ ঢেলে খেয়ে নিত গোচা, তারপর মাখন-মাখা শাদা রুটি চিবাত গাল ভরে। এরপর উঁকি দিত রান্নাঘরে, সেখানে যদি এমনকি ভুট্টার চাপাটিও মিলত, গিলতে দেরি হত না।

বাচো একদিন তাকে বললে:

— গোচা, বড়ো হলে তুই নিশ্চয় হবি একটা ভুঁদো আর দুর্বলা।

গোচা হাসল, কেননা রাগ করতে সে পারত না। বললে:

— না, বাচো, আমি হব তাকৎদার, তোর সঙ্গে যাব শিকারে।

— বনে তোর পেট চোঁচোঁ করবে খিদেয়, কান্না জুড়বি। শিকার তোর পোষাবে না!

— খিদে পেলে পাবে, কিন্তু আমি সহ্য করব, কেননা আমি মোটাসোটা আর আমাদের খাবারে টান থাকলে আমার ভাগটা তোকে দিয়ে দেব।

— ও আমার দরকার নেই! ইচ্ছে হলে আমি নিজেই মাংস সেঁকে নেব। জানিস, আমরা, শিকারীরা বনে খাওয়া-দাওয়া সারি কিভাবে?..

— তাহলে অন্য কোনোভাবে কাজে লাগব তোর। আমি হব খুব বলবান, তোকে সাহায্য করব।

— আমার দাদা, দিদি, খুড়তুতো ভাইয়েরা আছে। তারাই সবসময় সাহায্য করে আমায়!..

— বেশ, তাহলে যাদের দাদা নেই, তাদেরই সাহায্য করব!..

অভিমান হল গোচার, কিন্তু রাগ করতে সে পারত না, তাই হাসল।





যে-দেশে বাঘ থাকে, একদিন সেখান থেকে টিয়া উড়ে এল এক ভয়ংকর খবর নিয়ে: বাঘের ছানা, বাচোর পাতানো ভাইয়েরা কোথায় হারিয়ে গেছে, কী তাদের হল, বেঁচেই আছে কিনা কেউ জানে না। শোকে-দুঃখে বাঘিনী-মা শয্যা নিয়েছে। গাছের তলে নির্জীব হয়ে পড়ে থেকে সে টিয়াকে বলে বাচোর কাছে উড়ে যেতে:

— ও আমার ছানাদের সঙ্গে আমার বুকের দুধ খেয়ে মানুষ হয়েছে। যদি মনে থাকে, সাহায্য করুক।

গোচা বেড়ার ধারে গিয়ে দেখে বাচোর কাছে রঙচঙে এক পাখি, শুনল তার সংবাদ।

'বাচোকে বলব আমায় সঙ্গে নিতে?' ভাবল সে। 'যদি রাজী না হয়, চুপি চুপি তার পেছু নেব। বাঘ খুঁজে বার করা চাট্টিখানি কথা নয়। কত কিছুই তো ঘটতে পারে...'

আর বাচো যখন রওনা দিলে, আড়ালে আড়ালে গোচা চলল তার পেছু পেছু।

কতদূর গেল কে জানে, শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল বাঘেদের দেশে।

দেখা করল বাঘিনী-মায়ের সঙ্গে: শোকে-দুঃখে শুকিয়ে গেছে, একেবারে অস্থিকঙ্কালসার।

বাচো সান্ত্বনা দিলে:

— ভেবো না মা, তোমরা আমায় এখনো ভোলো নি, তাই পাতানো ভাইদের খুঁজে এনে দেব তোমার কাছে। ভাবনা করো না!

আর গোচা জানে সে মোটাসোটা ছেলে, তাই লুকিয়ে পড়ে মোটা মোটা গাছের আড়ালে। কেউ তাকে দেখতে পায় না, সে কিন্তু সব দেখে, সব শোনে।

বাচো ডাক দিল সেখানকার শিকারীদের।

নানা খান থেকে এসে জুটল নামকরা শিকারী। খুশি হয়ে বলে:

— আমাদের একেবারে ভুলে গেছ বাচো?

বাচো ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে:

— তোমাদের কেউ আমার পাতানো ভাই বাঘদের মারো নি তো?

— হেই ভগবান! তোমার পাতানো ভাই?! আমরা যে তোমায় খুব ভালোবাসি!..

— যাক গে, — থামিয়ে দিলে বাচো, — কথাবার্তার সময় নেই এখন। ভাইদের খুঁজতে হবে, — বলে চলে গেল।

নামকরা শিকারীরা ওকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে চেয়েছিল, কিন্তু এতই তার মন ভার যে কেউ সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারল না।









বন দিয়ে যায় বাচো, ভাবে, 'যাওয়া যাক পশুরাজ সিংহের কাছে, পশুর রাজ্যে কী ঘটছে যদি কেউ জানে, তবে সেই-ই জানবে...'

আর গোচা চলল তার পেছু পেছু, মোটা মোটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে অবিশ্যি।

রাজপ্রাসাদের কাছে এল বাচো। দূর থেকেই তাকে চিনতে পেরেছিল সবাই। প্রাসাদরক্ষী পশুরা দেখে, নামকরা শিকারীর ভুরু কোঁচকানো। ভাবল, 'কপাল খারাপ। হয়ত-বা আসছে আমাদের কোনো দুষ্টুমির জন্যে শাস্তি দিতে...' সবকটা ফটক, সবকটা দরজা খুলে দিয়ে কুর্নিশ করলে তারা:

— আসুন, আসুন মহাশিকারী! নিশ্চয়ই আমাদের রাজার কাছে!..'

পশুরাজের কাছে গেল বাচো।

আর সিংহ তদ্দিনে বুড়ো হয়ে গেছে, কানে শোনে না। চোখে দেখে কম। কিন্তু রাজা তো, কেউ তাকে উচ্ছেদ না করলে সে রাজত্ব করতে ছাড়বে কেন। দেয়ালে তার শিশু পত্রিকা থেকে কেটে টাঙানো বাচোর ছবি, কাছেই 'ছোট্টো শিকারী বাচো' বলে গ্রন্থমালা। তাই নামকরা শিকারীকে সে সঙ্গে সঙ্গেই চিনতে পারল। দেখে, ভুরু কুঁচকে আছে বাচো। ওহ্‌, কী হাউমাউ করেই না কেঁদে উঠল বেচারী:

— কোনো কসুর হয় নি বাছা, মাইরি বলছি, কোনো দোষ করি নি! ঘুমাবার আগে তোর ছবির সামনে রোজ রাত্রে প্রণাম করি। এবার থেকে সকালেও প্রণাম করব! এই বুড়ো দুর্ভাগার কাছ থেকে আর কী চাস তুই?!'







বাচো বললে:

— তোর প্রণামে আমার কাজ নেই। বরং বল, আমার পাতানো ভাইদের কথা কিছু শুনেছিস কিনা?

সিংহ কিন্তু কেবল নিজের কথাই আওড়ায়:

— আমি সিংহ হলেও খুব মায়াদয়া আছে। তোর কথা শোনার পর থেকে আমার ক্ষিদে একেবারে গেছে। আধপেটা খেয়ে আছি। তুই বললে আরো কম করে খাব, মাইরি বলছি। একেবারে কালা হয়ে গেছি।

— আমার পাতানো ভাইয়েরা কোথায় জানিস?! — তার কানে চিৎকার করে বললে বাচো।

সিংহ তাতে ভাবল যে বাচো কেন জানি তার ওপর খুব চটেছে, তাই তার পা ছুঁয়ে জুতোয় চুমু খেয়ে বললে:

— এখন থেকে দিনে তিনবার করে তোর ছবির সামনে মাথা নোয়াব...

হতাশে হাত নাড়লে বাচো, 'কী লাভ ওর সঙ্গে কথা কয়ে, রাজা হলেও একেবারে কালা!..'

পাত্রমিত্রদের একজন, চিতাবাঘ, কাছে এসে ভয়ে ভয়ে বললে:

— তোমার পাতানো ভাইদের সঙ্গে বুনো শুয়োরদের ঝগড়া ছিল। দ্যাখো গিয়ে কিছু হয়েছে কিনা...





বাচো ভাবল, ‘শুয়োর সে শুয়োরই। যেকোনো কুকর্মই সে করতে পারে।’ তাড়াতাড়ি রাজপুরী থেকে বেরিয়ে সে চলল খোঁজে...

ওদিকে গোচাও আছে সেখানে, মোটা মোটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে। পরে চলল বাচোর পেছু ধরে...

অনেকখন ধরে চলল বাচো। চলল জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। পেছনে পেছনে ছোটে গোচা।



জায়গায় জায়গায় গাছগুলো এত ঠাসাঠাসি যে মোটা গোচার পক্ষে সেঁধানো সম্ভব হয় না, তাই ঘুরে যেতে হয়।

শেষ হয়ে গেল বন। বাচো বেরিয়ে এল ঝুরঝুরে বালিতে। একটি গাছ নেই, একটি ঘাসও নেই।

বাচো ভাবলে, 'এত বালি, তাহলে কাছেই কোনো সমুদ্র কি নদী আছে নিশ্চয়।'

গোচাও বেরুল বন থেকে। হাঁপ ছাড়ল: যাক এখন আর গাছপালা ঘুরে যেতে হবে না। তারপর বাচোর চোখ এড়িয়ে গুঁড়ি মেরে চলল তার পেছু পেছু।

চলছে বাচো, চারিপাশে না আছে পশু, না আছে পাখি। নামকরা শিকারী এমন মরুভূমি জীবনে কখনো দেখে নি। 'কারো দেখা নিশ্চয় পাব,' এই ভেবে নিজেকে বুঝ দিয়ে সে চলল এগিয়ে।

যায়, যায় বাচো, শক্তি ফুরিয়ে আসে। ইচ্ছে হয় একটু বসে জিরিয়ে নেয়, কিন্তু ছায়া নেই কোথাও, কেবলি কাঠফাটা রোদ্দুর। তেষ্টা পায়, জল নেই। খিদে পায়, চারিদিকে কেবলি বালি।

ভাবে, 'ফিরে যাব, বাঘিনী-মাকে বলব কী? তাছাড়া বিনা জলে বিনা খাবারে ফেরা শক্তিতেও কুলবে না।'

ফের এগুতে লাগল বাচো। তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে কাঠ। খিদেয় পেট সেঁধিয়েছে পিঠে।









আর চারিদিকে কেবল বালি আর বালি। মরুভূমিতে তাছাড়া আর কীই-বা থাকবে?

শেষ পর্যন্ত বাচোর চোখে পড়ল চারপেয়ে এক জীব, কাঁটাগাছ খাচ্ছে। জীবন্ত প্রাণী দেখে খুশি হয়ে উঠল আমাদের নামকরা শিকারী। কাছাকাছি এসে চিনতে পারল উটকে, আনন্দে হাসি ফুটল মুখে:

— আরে আমার আদরের ঠোঁট-থপথপে!

— এখানে আমার চেয়ে সুন্দর আর কাউকে পাবে না, — মস্করা করল উট।

বাচো জিজ্ঞেস করলে:

— কী করা যায়, বলো তো? তেষ্টায় প্রাণ যায়।

— কী যে বলি, — মাথা নাড়ল উট, — আমার নিজেরই তেষ্টা পাচ্ছে। এখুনি যেতে হয়: হপ্তাখানেক হয়ত বিনা জলে টিকে থাকব।

— আমার দেশে প্রতি পদে ঝরনা, ফোয়ারা... — শুকনো ঠোঁট চাটল বাচো।

— আর আমার কাছে এ জায়গাটা দিব্যি ভালো। এখানে কাউকে ডরাতে হয় না। এই গিয়ে জল খেয়ে ফের চলে আসব।

— তা বটে, এখানে তোমার অবাধ স্বাধীনতা, — দীর্ঘশ্বাস ফেললে বাচো।

— সেটা ঠিক, — সায় দিলে উট, — কে এখানে আসবে? হয়ত কেউ পথ হারালে। নইলে জনপ্রাণী নেই... এই তো দিন কয়েক আগে বনশুয়োরের পাল দুটো বাচ্চা বাঘকে তাড়িয়ে এনেছিল। ভয়ে আমি

মরি আর কি। বাঘদুটো খিদেয় তেষ্টায় এমন জেরবার হয়ে পড়েছিল যে দাঁড়িয়ে থাকতেই পারছিল না। আমার দিকে নজরই নেই।

— আরে, এরা যে আমার পাতানো ভাই! — বলে ছুটল বাচো।

ছোটে, ছোটে — দেখে, বালিতে পড়ে আছে বাঘের বাচ্চা। তবে বাচ্চা আর এখন নয়, আসল বাঘ। পড়ে আছে, নিঃশ্বাস পড়ে কি পড়ে না, নড়ন-চড়ন নেই।

বাঘদুটো যমজ, দেখতে একরকম, যেন এক বৃন্তে দু'টি ফুল। শুধু একজনের ভুরু নীলচে, আরেকজনের চোখের পাতা সবজেটে — এই যা। নীলভুরুকে পাঁজাকোলা করে তুলল বাচো, কিন্তু দ্বিতীয়টাকে পারল না, তাকৎ নেই। কী করা যায়? ভাইদের একজনকে শুধু বাঁচিয়ে অন্যজনকে তো ফেলে রাখা যায় না! নীলভুরুকে নিয়ে চলল সে। চলল অনেকখন। হাঁপিয়ে পড়ল, নামিয়ে রাখল মাটিতে। তারপর ফিরে এসে চোখের সবুজ পাতা-ওয়ালা বাঘটাকে তুলে নিল। নিয়ে যায় আর ভাবে, 'এমনি করে যদি কেবল







আগুপিছু করি, তাহলে মরুভূমি থেকে বেরুনোই হবে না। বাঘ-ভাইদের মতো লুটিয়ে পড়ব।'

নীলভুরুকে যেখানে রেখে এসেছিল, গেল সেখান পর্যন্ত, কিন্তু তার চিহ্ন মাত্র নেই। মরুভূমিতে জায়গা ঠাহর করা কঠিন, কে জানে এখানেই বাঘটাকে রেখেছিল নাকি আরো দূরে। উপায় কী, এগিয়েই যেতে হয়।

চলল বাচো। যায়, যায়, শক্তি আর নেই। হঠাৎ দেখে সামনে বাঘ। বাচো ভাবলে,



‘ওর কাছ পর্যন্ত পৌঁছনো চাই।’ কিন্তু যত যায়, বাঘটাও যেন সরে যায় আরো দূরে। কেউ যেন ওকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কে? ‘কার গায়ে অত জোর?’ অবাক লাগল বাচোর। শেষ শক্তিটুকু খাটিয়ে সে কদম বাড়াল, কিন্তু নাগাল আর পায় না। ‘এইবার ধরব!’ — ক্ষেপে উঠল বাচো, ভুলে গেল খিদে তেষ্টার কথা, পাতানো ভাইকে অন্য হাতে ধরে ছুটতে লাগল। তারপর সব শক্তি যখন ফুরিয়ে এসেছে, দেখা দিল বন। ‘বন থাকলে জলও মিলবে,’ খুশি হয়ে উঠল বাচো।





সত্যিই তাই: বনের মধ্যে ঝরনার কাছে নীলভুরু বাঘ জল খাচ্ছে। কাছে এসে পাশেই নামিয়ে রাখল দ্বিতীয় বাঘটাকে, চোখের পাতা যার সবজেটে, সেও মুখ বাড়াল জলে। প্রাণভরে জল খেয়ে বাঘদুটো ধাতস্থ হল।

— কে তোকে এখানে বয়ে আনল? — নীলভুরুকে জিজ্ঞেস করল বাচো।

— কিছুই জানি না, — ফোঁস ফোঁস করলে বাঘ, — আমি ভেবেছিলাম তুই...

— তোকে নয়, বাচো এনেছে আমাকে। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না বটে, তবে সব মনে আছে, — চোখের সবুজ পাতা-ওয়ালা বাঘটা কোনোরকম করে বললে।

অবাক হয়ে বাচো চারিদিক চেয়ে দেখল। বনের ধারে মোটা মোটা গাছ ছিল না, তাই চট করেই গোচাকে দেখতে পেল সে। সরু গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল গোচা।

— গোচা! — চেঁচিয়ে উঠল বাচো। — বেরিয়ে আয়, গা ঢাকা দিয়ে লাভ নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি তোকে!

গোচা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হেসে উঠল।

— জল খা। তেষ্টা পায় নি?

— পেয়েছে, তবে সহ্য করে যাব।

— জল এখানে অনেক। আর সহ্য করে যাবার দরকার নেই।

— কে এটা? — অবাক লাগল নীলভুরু বাঘের। — কী মোটাসোটা ছেলে!..

বাচো বললে:

— এ আমার পড়শী। প্রচুর খায় সে, আর দেখছিস তো, গোটা মরুভূমি পাড়ি

দিয়ে এল, তোকে বয়ে আনল পিঠে করে। ঝরনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ জল খাচ্ছে না। তেষ্টা সহ্য করছে।

— বাহাদুর তোর পড়শী! —গরগর করে উঠল বাঘদুটো। — মরুভূমিতে আমরা প্রায় মরতে বসেছিলাম। তোর পক্ষেও মনে হয় সহজ হয় নি।

— গোচা না থাকলে আমাদের তিনজনকেই লুটতে হত গরম বালিতে।

পরে বাচো তার পড়শীর পরিচয় করিয়ে দিলে বাঘিনী-মায়ের সঙ্গে।

তার দিকে চেয়েও হাসল গোচা।

বাঘিনী-মা উঠে দাঁড়াল, গা ঝাড়া দিয়ে ছেলেদের বললে:

— দ্যাখ, কেমনভাবে থাকতে হয় পড়শীর সঙ্গে। এখন থেকে ঝগড়া-ঝাঁটি যেন আর না দেখি: পড়শীর সঙ্গে ভাব রাখতে হয়!

আর নীলভুরু ভাই হঠাৎ মুখ কাঁচুমাচু করে উঠল, গুহা থেকে লাল বেলুন বার করে ছুটল পড়শী চিতাবাঘ বাচ্চাদের কাছে। ছুটতে ছুটতেই ফুঁ দিয়ে ফোলাল বেলুনটাকে, ‘না ফুলিয়ে ফেরত দিলে রাগ করবে হয়ত...’





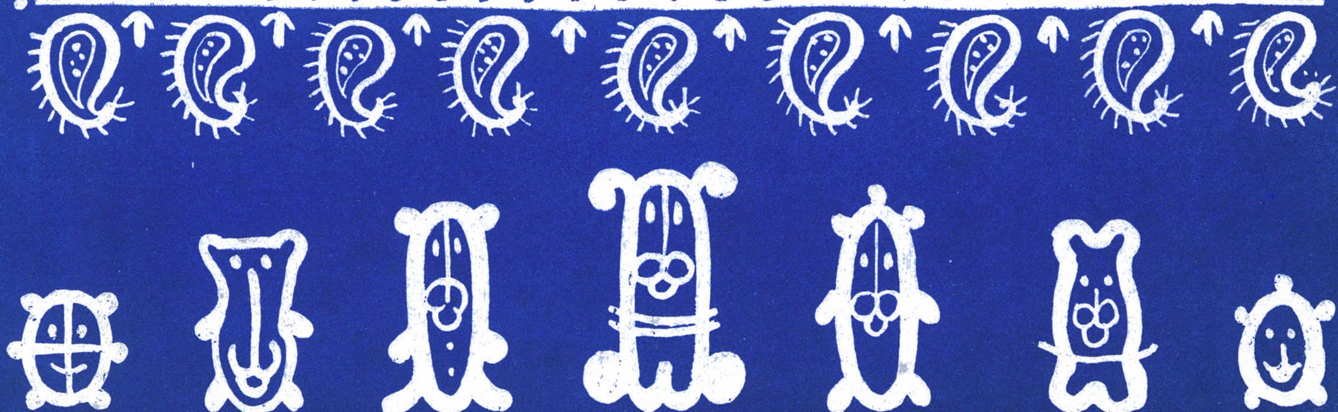
মূল রুশ থেকে অনুবাদ: ননী ভৌমিক
ছবি: ইউ. মলকানভ

О. ИОСЕЛИАНИ

СКАЗКА ПРО БАЧО И ГОЧУ

На языке бенгали

© বাংলা অনুবাদ · সচিত্র · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৭৫ সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত



И $\frac{70801-699}{014(01)-75}$ 806-74

